অধ্যায় ৫: পদাবলি সাহিত্য—৩

বিন্যাস ক্রম

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫.২ পরিচিতি
৫.৩ শাক্তসাধনা ও শাক্ত পদাবলি
৫.৪ পদ- ওগো রানি, নগরে কোলাহল
৫.৪.১ মূল পাঠ
৫.৪.২ শব্দার্থবোধ
৫.৪.৩ গদ্যরূপ
৫.৪.৪ কবি কৃতিত্ব
৫.৫ পদ- ওরে নবমী নিশি
৫.৫.১ মূল পাঠ
৫.৫.২ শব্দার্থবোধ
৫.৫.৩ গদ্যরূপ
৫.৫.৪ কবি কৃতিত্ব
৫.৬ বিজয়া পর্যায়ের পদ হিসাবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ
৫.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৫.৮ অতিরিক্ত পঠন
৫.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৫.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- শাক্ত সাধনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- শাক্ত পদাবলি বিষয়ে জানতে পারবেন।
- আগমনী পর্যায়ের বিষয়ে জানতে পারবেন।
- বিজয়া পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন।

৫.২ পরিচিতি

মধ্যযুগের শেষলগ্নে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তার পরবর্তীকালে রচিত শাক্ত পদাবলি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ সম্পদ। বৈষ্ণব পদাবলির ন্যায় শৃঙ্গার রস এর উপজীব্য নয়, বরং তার পরিবর্তে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বাৎসল্য রস। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি মূলক বৈষ্ণব সাহিত্য বাংলায় প্রভাব বিস্তার করলেও, অষ্টাদশ শতক থেকে তা জাতীয় জীবনে গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। সেইসঙ্গে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে মাতৃতান্ত্রিক পূজার্চনা। মাতৃ পাগল বাঙালির মাতৃ আরাধনার স্বরূপ শাক্ত পদাবলিতে কাব্যরূপ লাভ করেছে। শাক্ত সাধকগণ শক্তিরূপা জগজ্জননীকে কখনো ঘরের মেয়ে আবার কখনো মাতৃরূপে ভজনা করেছেন। তাই বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তেমনি শাক্ত পদাবলির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে উমা, পার্বতী , চণ্ডী ও কালিকাকে কেন্দ্র করে।

৫.৩ শাক্ত সাধনা ও শাক্ত পদাবলি

শাক্ত বিষয়ক ধর্ম চেতনার প্রাচীনতম পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে। যদিও শক্তিপূজার প্রধান উৎস হল অথর্ব বেদ। তবে মনে রাখার বিষয় শক্তিতত্ত্বে শক্তি হলেন তন্ত্রের উপাস্য। বেদে দর্শনে পুরাণে শক্তিতত্ত্বের আভাস থাকলেও তন্ত্রের মাতৃশক্তিই শাক্তদের আরাধ্য। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র তাই শক্তি দেবীই 'আদ্যা', 'অদ্বিতীয়া', 'অক্ষরা', 'পুরানী'। 'দেবীপুরাণ' অনুসারে রাধা, বরেন্দ্র কামরূপ, কামাক্ষ্যা, ভট্টদেশ (তিব্বত) প্রভৃতি স্থানে দেবী বামাচারী রূপে পূজা পান যা পরবর্তীতে শাক্ত সাধকদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং দেবীপুরাণ অনুসারে বাংলা তথা আমাদের দেশে শাক্তপূজার অবির্ভাব খ্রিঃপূঃ ৭-৮ এর মধ্যেই কিংবা তার কিছুকাল পূর্বে। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু জানিয়েছেন, 'অনার্য জাতির প্রভাবেই হোক বা আর্য ধর্মবিশ্বাসের নিজস্ব প্রেরণাতেই হোক, শক্তি উপাসনা প্রত্ন ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা গৃহীত হয়ে সমগ্র ভারতে কালক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তন্ত্রের সহায়তায় একটি বিশিষ্ট ধর্মপন্থায় পরিণত হয়েছিল।'

তন্ত্র সাধকরা মনে করেন বিশ্বভুবনে এক মহা শক্তির লীলা চলছে। সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস থেকে বিশ্বের যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির লীলা। আসলে শাক্ত মতে শিব ও শক্তির মিলিত রূপেই এই জগৎ। এক মহাশক্তিই বিভিন্নভাবে অপ্রাকৃত ও প্রকৃত সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হচ্ছেন ইনিই পরাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী। ইনিই আবার 'আদ্যা' শক্তি। তন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রাণিমাত্রকে সংহার করেন বলে যিনি মহাকাল তাকে যিনি সংহার করেন তিনিই আদ্যা, পরা, কালিকা, তিনি কালকে গ্রাস করেন বলেই তিনি কালী। শাক্ত সাধকগণ মাটির মূর্তিতে তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অন্যের কাছে যা মৃন্ময়ী সাধকগণের কাছে তাই চিন্ময়ী। আর এই চিন্ময়ীকে উপলব্ধির জন্য উপাসনার দরকার। দিব্যজীবনে অধিষ্ঠিত হওয়াই শাক্ত সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। ক্রিয়ামূলক এই সাধনার প্রথম স্তর ভাব ও ভক্তি। এরপর আসে দীক্ষা। পূর্ণ

দীক্ষা হলেই সাধকগণ দিব্য সাধনার উপযোগী হতে পারেন। দীক্ষা গ্রহণের পর মাতৃপূজা। তান্ত্রিকদের মন্ত্রের মাধ্যমে এ পূজা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাদের দৃষ্টিতে মন্ত্র আর দেবতা অভিন্ন। মহাশক্তির প্রকাশ হয় নাদে। এই নাদের প্রকাশ মন্ত্রের ধ্বনি, বর্ণ সেই ধ্বনির প্রতীক। তাই বীজমন্ত্র জপের রীতি আছে। শাক্তদের এরূপ সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তন্ত্র সাধনার দেহ সাধনা ব্যাপারটি। মূলত এই সাধনার মূল লক্ষ্য পরম শান্তি শুদ্ধ, অদ্বৈত শিবজ্ঞানে বা দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

পুরাণ ও তন্ত্রে শক্তি দেবী হলেন ভয়ঙ্করী। তবে তিনি যে কেবল ভয়ঙ্কর নন, সাধক ভক্তদের জন্য শুভ মঙ্গল বার্তা বহন করে আনেন তার জন্যেও তিনি মাতৃ স্বরূপা। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন,- 'Kali appears to be divine mother hood' -এই নিগূঢ় অনুভূতির কথাই শাক্তকবিরা তাদের শাক্ত সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। শাক্ত কবিরা মূলত বেদ, পুরাণ এবং বিভিন্ন দর্শনে যে শক্তি দেবীর আরাধনা করা হয়েছে, সেই শক্তি তত্ত্বকেই কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তেমনি তারা পেয়েছেন আরাধ্য দেবীর কৃপায় শতদুঃখে বিদীর্ণ পৃথিবীর অপরূপ রহস্যলোকের সন্ধান। একদিকে 'আগমনী-বিজয়া' পর্বে রয়েছে মাতৃরূপা দয়াময়ীর চিত্ররূপ আর অন্যদিকে রয়েছে অসুরবিনাশিনী মায়ের ভয়ঙ্কর প্রতিরূপ।

৫.৪ পদ- ওগো রানি, নগরে কোলাহল

৫.৪.১ মূল পাঠ:

ওগো রানি নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া,
এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায়, অদেয় কি আছে, এসো দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রানি, ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে,
খসিল কুন্তলভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে,
গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ,
নিরখি বদন উমার।

বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে?
মা বলে একি কথা মার গো॥
রথ হোতে নাবিয়া শঙ্করী, মায়ে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে
এমন শুভ দিন আর কার গো।

৫.৪.২ শব্দার্থবোধ : কোলাহল- শোরগোল, নন্দিনী- কন্যা, গৃহে- ঘরে, খসিল- খুলে গেল, কুন্তল- চুল, নিকটে- কাছে, সুধাইছে- জিজ্ঞাসা করছে, উপনীত- উপস্থিত হওয়া, নিরখি- দেখে, নাবিয়া- নেমে, শঙ্করী- শঙ্করের স্ত্রী, সকরুণ- করুণার সহিত।

৫.৪.৩ গদ্যরূপ : রানি মেনকাকে তার সহচরী জয়া রানিকে খবর দিয়েছেন যে তার কন্যা তার কাছে এসে পৌঁছেছে। জয়া পরামর্শ দিয়েছেন যে তার কন্যাকে বরণ করে নিয়ে তাকে গৃহে নিয়ে আসতে। মেনকা এই সংবাদ পেয়ে খুশি হয়ে জানান যে তাকে শুভ সমাচার দিয়েছে তাতে সে মেনকাকে কিনে ফেলেছে। রানি খুশিতে পথে আলুথালু চুলে বেড়িয়ে পরেন এবং পথে যাকে পেয়েছেন তাকেই তার কন্যা কতদূর আছে তা জিজ্ঞাসা করছেন। পথে যেতে যেতেই দেখেন রথ থেকে নেমে আসা উমার মুখ দেখেন। রথ থেকে নেমে এসে উমা তার মাকে প্রণাম করে মাকে সান্ত্বনা দেয়। শ্রীকবিরঞ্জন জানায় এমন শুভ দিন আর কী হতে পারে।

৫.৪.৪ কবি কৃতিত্ব : শাক্ত গীতিকারদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার হলেন মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদ সেনের পূর্বজ কৃত্তিবাস সেন ছিলেন শাক্ত সাধক সেই থেকে তারা শাক্ত। কৃত্তিবাস সেনের পুত্র রামেশ্বর সেন তার পুত্র হলেন রামরাম সেন, এই রামরাম সেনের দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান হলেন রামপ্রসাদ সেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র রামপ্রসাদ খুব কম বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্য বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেন। পিতা রামরাম সেন চাইতেন যে পুত্র রামপ্রসাদ তাঁর কবিরাজী ব্যবসায় যোগ দেবেন কিন্তু রামপ্রসাদের কবিরাজীতে রুচি ছিল না বরং তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। ঘটনাচক্রে এ সময় মোগল শাসনের আধিপত্য থাকায় তাঁর পিতা তাকে ফারসী ও হিন্দী ভাষা শেখার অনুমতি দেন। পিতা রামপ্রসাদের মধ্যে সংসার সম্পর্কে উদাসীনতা লক্ষ্য করার ফলে তাকে ২২ বৎসর বয়সে সর্বগুণসম্পন্ন সর্বাণীর সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিষয়কর্মে লিপ্ত হন। কলকাতার এক ধনাঢ্য ভূস্বামীর বাড়িতে তিনি মুহুরিগিরির কাজ করেন। তাকে নিয়ে নানা অলৌকিক কাহিনি ছড়িয়ে পড়ে। তবে তিনি একজন বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন, তাঁর সুর 'প্রসাদী' সুর নামে খ্যাতি পায়।

রামপ্রসাদ কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন নামে দু-খানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেছিলেন, তার মধ্যে কৃষ্ণকীর্তনের যৎসামান্য পাওয়া গেছে। কিন্তু কালীকীর্তনের পুঁথি দুর্লভ নয়। এতে তিনি বৈষ্ণব পদাবলির ছাঁদে উমার বাল্য ও গোষ্ঠ বর্ণনা করেছেন। এ কথা বলতেই হবে যে, কালীকীর্তনে

রামপ্রসাদের প্রতিভা প্রকাশের পথ পায়নি। উমা কৃষ্ণের মতো মাঠে গিয়ে গরু চরাচ্ছেন, বাঁশি বাজিয়ে গরুকে ডাক দিচ্ছেন-এ বর্ণনা অনেক স্থলেই হাস্যকর। এই বিসদৃশ বর্ণনাকে ব্যঙ্গ করে আজু গোঁসাই নামে তাঁর সেই প্রতিবেশী বলেছিলেন- "না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।" কালীকীর্তনের ওপর রামপ্রসাদের কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি- তাঁর যা কিছু খ্যাতি, তা তাঁর শাক্ত গানের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে মুদ্রিত রামপ্রসাদের পদাবলির সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। এখন তা বেড়ে বেড়ে প্রায় তিনশ'তে দাঁড়িয়েছে। এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটা স্তর লক্ষ করা যায়: ১. উমা-বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), ২. সাধন-বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত সাধনা), ৩. দেবীর বিরাট স্বরূপ-বিষয়ক, ৪. তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক। এর মধ্যে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদের সংখ্যাও অল্প, গুণগত উৎকর্ষও অল্প। সাধন-বিষয়ক পদে কবি নানা উপমা রূপকের মধ্য দিয়ে নিজের সাধনার কথা আভাসে ব্যক্ত করেছেন। তত্ত্ব ও নীতির বিষয়ে তিনি যে সমস্ত গান লিখেছিলেন, তাতে শুদ্ধ নীতি ও নিষ্করুণ বৈরাগ্য ব্যতীত আর কোনো উচ্চতর অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু আদ্যাশক্তির স্বরূপ এবং তাঁর সঙ্গে কবির বাৎসল্যরসের যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। উমার বাল্যলীলাসংক্রান্ত যে-পদটি রামপ্রসাদের ভণিতায় চলে ('গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে'), বৈষ্ণব পদাবলিতেও তার সমকক্ষ বাৎসল্যরসের পদ দুর্লভ।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.৬ পদ -ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।

৫.৬.১ মূল পাঠ

ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।।
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরি প্রাণ।।
প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি-ভয়,
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন-বাণ।।
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, পাসরিলাম সব দুখ,

আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন-জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরাণি।
লুকায়ে রাখ না মা'রে হৃদয়ে দিয়ে স্থান।।

৫.৬.২ শব্দার্থবোধ : সতের মান = সতীর মান, কুমুদবরে= পদ্মের সহিত আর্শীবাদ; তনয়া= মেয়ে, দিনমণি- সূর্য

৫.৬.৩ গদ্যরূপ: বাঙালির মনে যুগ যুগ ধরে মা উমাকে নিজের মেয়ে মনে করে যে ভাবনার উদয় হয়ে এসেছে সেই ভাবনাকে রূপ দিয়ে শাক্ত পদাবলির পদকর্তারা বিভিন্ন পর্যায়ে পদ রচনা করেছেন। উপযুক্ত পদটি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের একটি বিজয়া পর্যায়ের পদ। তার গদ্যরূপ ব্যাখ্যা— উমা পিতা ও মাতা (গিরিরাজ ও মেনকা)র ঘরে এসেছেন। অষ্টমীর দিন সকলের মনে যে আনন্দ থাকে যত সময় এগিয়ে যেতে থাকে সবার মনে চিনচিন এক বেদনার উপলব্দি শুরু হয়। সেই বেদনা নবমী রাতে আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে। তাই সকলের আবেদন যেন এই নবমী নিশি অবসান না হয়। নবমী-নিশির মূলভাব নবমী নিশিতের পর দিবসের আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনায় মেনকার বেদনার প্রকাশ ও নবমী রাত্রিকে প্রশ্নদাত্রীরূপে কল্পনা করে তাকে চলে না যাওযার জন্য নিবেদন জ্ঞাপন করেছেন।

আলোচ্য পদেও মানবীয় ভাবনার প্রাধান্য বেশি। এখানে মেনকা স্নেহময়ী চিরকালীন বঙ্গ জননীরূপে কন্যা উমার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর। এ যেন গ্রামবাংলার এক চিরন্তন চিত্র। সাধারণ বাঙালী গৃহেও মা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর আগে বেদনায় জর্জরিত হন এবং সন্তানকে নিজের কাছে আগলে রাখতে চান। কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদা অধীর থাকেন। এই পদটিতেও সেইরকম চিত্রের পরিস্ফুটন লক্ষ্য করা যায়। হৃদয়াসনে চির কালের জন্য অধিষ্ঠিত করার কথা বলেছেন। কারণ হৃদয়রাজ্যে যার বাস যে সর্বরূপে মায়ের সঙ্গে বসবাস করবে। তাই মেনকাকে কন্যা বিচ্ছেদ হওয়ায় কথা মনে করিয়ে দেয়।

৫.৬.৪ কবি কৃতিত্ব

সাধক কমলাকান্ত ছিলেন বর্ধমান নিবাসী। তাঁর প্রথম জীবনের একখানি গ্রন্থ 'সাধক-রঞ্জন' নামে ছিল। এই গ্রন্থ তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা গ্রামে। ছোটবেলায় তিনি সংস্কৃত বিদ্যা অর্জন করেন। তাঁর বিজয়া পর্যায়ের গানটি অতি চমৎকার। মেনকার দুঃখবেদনা কবি অপরূপ কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালি মায়ের কন্যাবিরহের বাস্তব বেদনার কথা ফুটে উঠেছে গানগুলিতে। তার সমস্ত গানের ভাষা ও বিন্যাসপদ্ধতি অতিশয় মার্জিত ও দৃঢ়সংবদ্ধ ছিল। বাংলার শাক্ত পদসাহিত্যের আর একজন কবি ও সাধক প্রায় রামপ্রসাদের মতোই গৌরব লাভ করেছেন, তাঁরই মতো স্মরণীয় হয়েছেন এবং ভক্তিরস, সংগীতরস ও কবিত্বে তিনি রামপ্রসাদের সমকক্ষতা লাভ করেছেন।

তিনি বর্ধমান-নিবাসী সাধক ও কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাঁর অলৌকিক জীবন-কথা রামপ্রসাদের মতোই জনপ্রবাদের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কমলাকান্ত প্রথম জীবনে 'সাধক-রঞ্জন' নামে একখানি তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ বাংলা কবিতায় রচনা করেছিলেন-তার শেষে কবি যে যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বর্ধমান নিবাস কালে তিনি বর্ধমান রাজবাটীর গভীর সংস্পর্শে আসেন, উক্ত রাজারা তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

২। টীকা লিখুন- নবমী নিশি (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.৭ বিজয়া পর্যায়ের পদ হিসাবে তাৎপর্য বিশ্লেষণ

বিজয়ার সময় কাল মাত্র দুই দিন। নবমী ও দশমী। এই সংগীতগুলিতে বাঙালি সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। মেনকা চরিত্র শাক্ত-গীতিকায় আগমনী পর্যায়ের পদের সংখ্যা প্রচুর, বিজয়ার পদ সে তুলনায় অনেক কম। এই প্রাচুর্যের বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত, শরতের প্রথম আবির্ভাব থেকে শারদ শুক্লপক্ষের বোধন পর্যন্ত আগমনী গানের সময়সীমা কিন্তু বিজয়ার আয়ুষ্কাল মাত্র দু'দিন নবমী ও দশমী; দ্বিতীয়ত, আগমনী গানে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আগমনী পর্যায়ের গানে দুটি স্তবক: পূর্ব-আগমনী ও উত্তর-আগমনী। পূর্ব-আগমনী পর্যায়ে শরৎকাল শুরু হতেই মেনকার উমাকে মাতৃগৃহে আনার জন্যে ব্যাকুলতা, স্বপ্ন-দর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয় ইত্যাদি বর্ণিত এবং উত্তর-আগমনীতে কন্যা ও মাতার মিলন ও আনন্দোল্লাস। আগমনী গানে এই ঘটনাবলি যেন পরস্পর সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাবলির ন্যায়-যার চরম পরিণতি বিজয়ার গানে। আগমনী ও বিজয়া গান বাঙালির হৃদয়-মথিত আনন্দবিরহ সঙ্গীত। "আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত কাব্য সম্পদ অযাচিত দৈবপ্রেরণায় যেন বাঙালি কবিদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল, তার বিষয়গত মাধুর্য আস্বাদনের জন্য যেন অধিকারীভেদ ছিল না। মাতৃসেবায় যেমন ভক্তের শ্রেনি নির্ণয় করা হয় না, আগমনী বিজয়া পদেও তেমনি প্রতিভাহীন ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পদকর্তা একসূত্রে বাঁধা পড়েছেন। শরত-রৌদ্রপায়ী শিশিরের দ্রুত বিলীয়মান লাবণ্যের মত এক টুকরো উদাসী ভৈরবী রামকেলী ললিত মাখিয়ে অতি সাধারণ সেই পুরাতন পরিচিত মেনকার আক্ষেপটিকে সমগ্র আকাশের মর্মবেদনা করে তুলতে পেরেছেন যিনি, তিনিই আগমনী পদকর্তা। বিজয়া সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায়।"

প্রকৃতপক্ষে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি বাঙালি সমাজের ছবি। বাঙালি কবি তাঁর নিজস্ব ভাবনায় উমা, মেনকা, গিরিরাজ, ভোলানাথের চরিত্র এঁকেছেন। চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পৌরাণিক সত্তা হারিয়ে বাঙালির একান্ত পরিচিত চরিত্ররূপে আমাদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়ে গিয়েছে। কন্যাবৎসলা মেনকা, স্বভাব-অচল অথচ স্নেহব্যাকুল গিরিরাজ। স্নেহাভিমানী উমা একান্তভাবেই বাঙালি কবির সৃষ্টি। বাঙালি মায়ের সন্তান বাৎসল্য মেনকার মধ্যে চূড়ান্ত গভীরতা ও নিবিড়তা লাভ করেছে।

"পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রটিই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। জননী মেনকার অপার বাৎসল্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অমর মহিমা বিঘোষিত হয়েছে। কন্যাসন্তানের জন্য জননীর হৃদয়োত্থিত অশ্রান্ত অশ্রুর ধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলি অভিষিক্ত। গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ তন্ময়তা, আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রুকাতরতা, তাহার পুঙ্খাপুঙ্খ বিশ্লেষণে ও সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্ত পদাবলির লীলা-অংশ করুণ মধুর।" সন্তান বাৎসল্যের আনন্দ ও বেদনার অপরূপ আলেখ্যের বাস্তব চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনবদ্যভাবে প্রকাশিত "হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলা দেশের একটা বড় মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। একান্ন পরিবারের আমরা দূর ও নিকট ভিতরে সকলে চাহিয়া দেখিল কৈলাসবাহিনী মা ভবানী সহসা কেমন স্মিত হাস্যে ভাঙা কুটির আলো করিয়া স্নেহের দুলালী রূপ ধারণ করিয়া বিরাজমানা-তিনি একাধারে দেবী হইয়া মানবী আবার মানবী হইয়া দেবী। আশ্চর্য তাঁহার সেই রূপ-দেবীতে আর মানবীতে স্বরূপে আর রূপে-কোথায় যে ভেদ কিছুই আর বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে-প্রেমলীলার ক্ষেত্রে আগমন করিলেন বাঙালী প্রাণ ভরিয়া আগমনী গান গাহিল দশমী দিনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বরূপের দেশে যাত্রা করিলেন, রসপিপাসু বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠিল, চোখের তারার ধারায় ভিজাইয়া তাহারা কৈলাসগামিনী তারার গান গাহিল-তাহাই বিজয়া সঙ্গীত। "

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও এই তত্ত্বের সম্যক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থের 'শরৎ' প্রবন্ধে- "আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নতুন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।"

আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত ধর্মীয় বা পৌরাণিক পটভূমির উপর রচিত হলেও সেখানে উভয় পটভূমিই ম্লান হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে মুখ্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার চিত্রের মধ্যেও অনাবিল আনন্দের মধুর সুন্দর প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতধর্মিতা। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে। "আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে-মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতরস্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসবে পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। "

৫.৮ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- শাক্ত সাধনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারলেন।
- শাক্ত পদাবলি বিষয়ে জানতে পারলেন।
- আগমনী পর্যায়ের বিষয়ে জানতে পারলেন।
- বিজয়া পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারলেন।

৫.৯ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (২০১৮); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার (আগস্ট,২০১৭); কলকাতা: প্রজ্ঞাবিকাশ
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০০৮); বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা; কলকাতা: তুলসীপ্রকাশন
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার(২০১৬-২০১৭); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ(সম্পা) ২০১০); শাক্ত পদাবলী; কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৫.১০ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘ক’ ১। নং প্রশ্নের উত্তর: প্রথমে মুদ্রিত রামপ্রসাদের পদাবলীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশো। ..... উমার বাল্যলীলাসংক্রান্ত যে-পদটি রামপ্রসাদের ভণিতায় চলে (‘গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে’), বৈষ্ণব পদাবলীতেও তার সমকক্ষ বাৎসল্যরসের পদ দুর্লভ। - এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘খ’ ১। নং প্রশ্নের উত্তর: অষ্টমীর দিন সকলের মনে যে আনন্দ থাকে যত সময় এগিয়ে যেতে থাকে সবার মনে চিনচিন এক বেদনার উপলব্দি শুরু হয়। সেই বেদনা নবমী রাতে আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে।..... তাই মেনকাকে কন্যা বিচ্ছেদ হওয়ায় কথা মনে করিয়ে দেয়। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৫.১১ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘ওগো রানি, নগরে কোলাহল...’ পদের আলোকে আগমনী গানের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। আপনার পাঠ্য পদের আলোকে উমা সঙ্গীতে মায়ের মনের আকুলতা বিষয়ে প্রতিবেদন লিখুন।

৩। আপনার পাঠ্য পদের আলোকে উমা সঙ্গীতে বর্ণিত বাংলার পরিবার ও সমাজের সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৪। ‘ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।’ -পদের আলোকে বিজয়া গানের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

৫। ‘ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।’ -পদের আলোকে কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের বিজয়া পদের কবিকৃতিত্ব আলোচনা করুন।

*** *** ***